২০০৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল অনেককে অবাক করে দিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট মোট ২২০টি লোকসভা আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে NDA জোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৭। বাম দলগুলির জোট উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য লাভ করে এবং তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০। ফলে, কোন জোটের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA জোট মনমোহন সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে সরকার গঠন করে এবং বাম দলগুলির জোট এই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জানায়।

এই নির্বাচনের ফলাফল কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করে। প্রথমত, NDA-এর পরাজয়কে অনেকে অধিষ্ঠিত সরকার বিরোধী (anti-incumbency) মনোভাবের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের যে অবক্ষয় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল এই নির্বাচন তা রোধ করে পুনরায় এই দলকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনল। কংগ্রেস জোটের এই বিজয়কে অনেকে "Rainbow Coalition"-এর বিজয় বলে অভিহিত করেন। তৃতীয়ত, এই নির্বাচন বাম দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তাদের ভারসাম্য রক্ষাকারীর (balancer) ভূমিকায় এনে দিল। চতুর্থত, এই নির্বাচন এককভাবে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের যুগের সম্ভবত পরিসমাপ্তি ঘটাল, সঙ্গে সঙ্গে জোট-সরকারের অনিবার্যতা ও কিছুটা সাফল্য প্রতিষ্ঠিত করল। বর্তমানে এই UPA জোট সরকারই কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সর্বোপরি, এই নির্বাচনের পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে UPA সরকার ক্ষমতাসীন হোল তা সমর্থন লাভ করেছে কংগ্রেস দলের চিরবিরোধী বামপন্থী দলগুলি, বিশেষত, CPI(M)-এর কাছ থেকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হোল যে, মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও সরকার গঠনের কাজে পরস্পর বিরোধী দুই দলের দূরত্ব কমিয়ে তাদের মধ্যে আপস করা সম্ভব। এককথায়, দলগুলির কাছে সব থেকে বড়ো প্রশ্ন ছিল কি করে ক্ষমতায় আসা যায় এবং স্থায়ী সরকার গড়ে তোলা যায়? এর জন্য প্রয়োজনমতো মতাদর্শের পরিবর্তন ও আপস করা অনিবার্য হোয়ে উঠেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলগুলির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল।

১.২ ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ঃ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Nature of the Indian Party System : Features)

ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিবর্তনের যে আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা হোল তার থেকে দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমেই দলীয় ব্যবস্থার যে মূল সূত্রটি ধরা পড়ে তা হোল দলগুলির ক্রমাগত ভঙ্গুরতার বৈশিষ্ট্য। দেশ জুড়ে সামাজিক ও আঞ্চলিক শক্তির প্রভাবে যে ভঙ্গুরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা যায় রাজনৈতিক দলের উপর তার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে, ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হোল যে, জনগণ তাদের বিভিন্ন চাহিদাগুলির গ্রন্থীকরণ করার চেষ্টা করেছে নানা সমস্যাগুলিকে স্মরণে রেখে। এর মধ্যে ধর্মগত, বংশগত, ভাষাগত এবং জাতপাতগত দাবীগুলি তো আছেই, আবার তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সামাজিক পদমর্যাদার প্রশ্নগুলি। আমাদের মতো এত বড়ো দেশে উপরোক্ত দাবীগুলি এক এক অঞ্চলে এক এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ফলে একই শ্লোগান দেশের সর্বত্র একই

অর্থ বহন করে না। এই কারণে, বিভিন্ন ধরণের জনমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত কারণেই ভারতে অনিবার্যভাবে বহু দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র দল জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে নূতন নূতন জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলিকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। ২০০৪ সালে লোকসভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মোট ৪১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। ২০০০ সালে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে, জাতীয় দল বলে বিবেচিত হোতে গেলে সেই দলকে—(১) চার অথবা তার অধিক রাজ্যে লোকসভার নির্বাচনে মোট বৈধ ভোটের অন্তত ছয় শতাংশ পেতে হবে, অথবা (২) যে কোন রাজ্যে মোট ৪টি লোকসভা আসনে জয়ী হোতে হবে, অথবা (৩) লোকসভার মোট আসনের দুই শতাংশ আসন লাভ করতে হবে অর্থাৎ ৫৪৩টি মোট আসনের মধ্যে অন্তত ১১টি আসন পেতে হবে। ২০০০ সালের এই নীতি রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারটিকে আগের থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার অবস্থিতি হোচ্ছে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ছিল। মরিস জোনস্, রজনী কোঠারী প্রভৃতি লেখকগণ এটিকে বলেছেন, "One party dominant system"। ১৯৮০ সালের নির্বাচনের পর পুনরায় কংগ্রেসের আধিপত্য দেখা যায়, যদিও এই আধিপত্যের প্রকৃতি ১৯৫২-৬৭ সালের আধিপত্য অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র।*

তৃতীয়ত, আক্ষরিক অর্থে জাতীয় দলের অস্তিত্বের অভাব দেখা যায়। পল ব্রাস, এস.এল. সিক্রি প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে সারা দেশ জুড়ে জাতীয় রাজনৈতিক দল বলতে কংগ্রেসকেই ধরা যায়। অন্যান্য কয়েকটি দল জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও সমগ্র দেশে তাদের অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দলের পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ভিন্ন ভিন্ন দল, যেমন—১৯৫২ সালে সমাজতান্ত্রিক দল, ১৯৬২ সালে সি.পি.আই., ১৯৬৭ সালে জনসংঘ, ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস, ১৯৮০-তে জনতা দল, ১৯৮৪ সালে তেলেগু দেশম ইত্যাদি। পরবর্তীকালে জোট-সরকারের প্রাধান্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে যে, বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্যের ফলে একটি সুসংহত ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে বিরোধী দলগুলির গুরুত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলির থেকে অধিক। কিন্তু মতাদর্শগত বিভিন্নতা, ব্যক্তিগত কলহ, ব্যক্তি স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ প্রভৃতি সমস্যাগুলি সংহতি সাধনের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে জাতীয় স্তরে যতদিন কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল ততদিন কোন দলই তার বিকল্প হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে জোট গঠনের ফলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট গঠিত হওয়ায় একটি জোট অন্যের বিকল্প হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে।

---

* কংগ্রেস দলের আধিপত্য সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা আগের অধ্যায়ে ৭ পৃষ্ঠাতে করা হোয়েছে।

চতুর্থত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাঙন ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার এক বিচিত্র নিদর্শন। স্বাধীনতার পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের একাধিপত্যকালে ভাঙনের দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখা যায়নি। ১৯৬৭ সালে প্রথম কংগ্রেস দল শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস হিসাবে বিভক্ত হয়। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস থেকেই গড়ে ওঠে কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী। রাজ্যস্তরে আবার বাংলা কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস ইত্যাদি দল দেখা দেয়। ১৯৭৭ সালে জনতা দল গড়ে উঠেছিল সংগঠন কংগ্রেস, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী, লোকদল, জনসংঘ ইত্যাদি দলগুলির সংযুক্তিকরণের ফলে। পরে জনতা দলও জনতা (এস), বি. জে. পি ইত্যাদি দলে ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে, বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও ভাঙন দেখা দেয়। ১৯৬৪ সালে CPI থেকে সৃষ্টি হয় CPI (M) এবং পরে ১৯৬৭ সালে জন্ম হয় CPI (ML)-এর।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এই যে ভাঙা-গড়ার খেলা তার পিছনে প্রধান কারণ হোচ্ছে যে, বহু ক্ষেত্রে মতাদর্শের প্রতি যে আকর্ষণ এবং অঙ্গীকার তা উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জাত-পাত, সাম্প্রদায়িক শক্তি ইত্যাদি বিভেদমূলক ও অশুভ উপাদানগুলির সঙ্গে আপস করা হোয়েছে। ১৯৬৭ সালের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেওয়ায় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মূল উদ্দেশ্য হোয়ে দাঁড়ায়, যে কোন উপায়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে সামনের সারিতে আসতেই হবে।

দলগুলির ভাঙনের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় দলব্যবস্থার আর এক বৈশিষ্ট্য হোল মতাদর্শের প্রতি উদাসীনতা। মতাদর্শ সাধারণত দলগুলির কাছে ধর্মের সামিল, এই মতাদর্শের ভিত্তিতেই দলগুলি জনগণকে প্রভাবিত করে এবং লক্ষ্য পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যায়। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু দলীয় আদর্শ বা নির্বাচনী ইস্তাহার হোচ্ছে এমন একটি বস্তু যা সুবিধা মতো পরিবর্তন করা যায় ক্ষমতা দখলের স্বার্থে। বলা হয় যে, দলীয় মতাদর্শ হোল "a matter of convenience and not a factor of conviction". ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে এমন নেতার সংখ্যা নিতান্তই কম যাঁরা সময় ও সুযোগ মতো একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেননি।

পঞ্চমত, ভারতের সামাজিক বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ধর্ম, সম্প্রদায়, জাত-পাত এবং ভাষা ভিত্তিক দল। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, অকালি দল, শিবসেনা ইত্যাদি দলগুলি। বি.জে.পি ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত না হোলেও RSS (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা এবং হিন্দুত্ব রক্ষার প্রতি এই দলের অঙ্গীকারবদ্ধতা একে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক দলের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার বিষয় হোল যে, অনেক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনী স্বার্থে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেছে। যেমন—একসময় কংগ্রেস দল কেরালা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছে। আবার বামপন্থী CPI(M) দলও কেরালায় ১৯৬৭-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সঙ্গে এবং পরে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সঙ্গে ১৯৭৪ সাল থেকে কিছুদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। ভোটের সময় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি প্রার্থী নির্বাচন বা প্রচারের ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

ভাষার ভিত্তিতে তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে, এ.আই.এ.ডি.এম.কে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলায় গোর্খালীগ, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতির দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলির মতাদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা-ভিত্তিক দাবীগুলি লক্ষ্য করা যায়।

দলিত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য শোষিত দল, বহুজন সমাজ পার্টি ইত্যাদি গঠিত হোয়েছে। সম্প্রতি এপ্রিল ও মে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে মায়াবতীর নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। নির্বাচনের সময় জাত-পাত ভিত্তিক সংগঠন বহু রাজ্যে গড়ে উঠেছে, যেমন—উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে আহির-জাঠ-গুর্জর ও রাজপুতদের সমন্বয়ে গঠিত AJGAR.

ষষ্ঠত, ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হোল দলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে যেখানে মোট ১৯টি আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব ছিল সেখানে ২০০৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে ৪৪টি আঞ্চলিক দলের উপস্থিতি দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় দলের শক্তি হ্রাস ও আঞ্চলিক দলের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের সামাজিক বহুত্ববাদের কারণেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হোয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলির প্রতি জাতীয় দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিকতার রাজনীতি উৎসাহিত হোয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে, এ.আই.এ.ডি.এম.কে, পাঞ্জাবের অকালি দল, পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল ও তৃণমূল কংগ্রেস, নাগাল্যাণ্ডের নাগা জাতীয় সম্মেলন ও সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা, জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় কনফারেন্স, অসমের অসম গণ পরিষদ, অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম ইত্যাদি। সর্বভারতীয় দলগুলি অনেক সময় আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া করতে বাধ্য হোয়েছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল এ.আই.এ.ডি.এম.কে-র সঙ্গে বোঝাপড়া করে। একসময়, অন্ধ্রের তেলেগু দেশম কংগ্রেস দলের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই তেলেগু দেশম কংগ্রেস দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রাধান্য বৃদ্ধি করেছে। জাতীয় দলগুলির সুবিধাবাদী মনোভাব আঞ্চলিক দলগুলিকে প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছে। নব্বই-এর দশকে যখন ভারতীয় রাজনীতিতে জোট সরকারের যুগ শুরু হয় তখন আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০০৪ সালে যে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে UPA জোটে ডি.এম.কে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, ন্যাশানাল কংগ্রেস দল, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলি সামিল হয়। অন্যদিকে NDA জোটেও শিবসেনা, শিরোমণি অকালি দল, তেলেগু দশম প্রভৃতি যোগ দেয়। আগামী দিনে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার আরও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়।

সপ্তমত, অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল তত্ত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোলেও দলগুলির সাংগঠনিক ভিত্তিতে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অধিকাংশ দলেরই সাংগঠনিক নির্বাচন ঠিক সময়মতো হয় না। ফলে, দলের শীর্ষ নেতারা ও দলীয় এলিট সম্প্রদায় দলের সাধারণ সদস্যদের উপর ব্যক্তিগত আধিপত্য রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই অবস্থা কংগ্রেস, বি.জে.পি বা বামপন্থী সব দলগুলির মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা গেছে। এই কারণে, নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে সাংগঠনিক নির্বাচন করার নির্দেশ দান করেছে।

রাজনৈতিক দলের কাঠামোর এই অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির দুটি পরিণাম দেখা গেছে। প্রথমত, ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় হোলেও দলীয় কাঠামোতে এককেন্দ্রিকতার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব (Party High Command) রাজ্যস্তরের দলগুলির নীতি নির্দ্ধারণ করেছে এবং নানা ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছে, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনেও ছিল কেন্দ্রের প্রবল

সমাজে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের সাধারণ সদস্যরা নেতাদের নির্বাচন করে কিন্তু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে অনেক সময় উল্টোটাই ঘটেছে। নেতারাই নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পছন্দমতো দলের সাধারণ সদস্যদের মনোনীত করেছে।

এই অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির দ্বিতীয় পরিণাম হোল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলের উদ্ভব। বিশেষ কোন বা কয়েকজন নেতাদের কেন্দ্র করেই দলীয় রাজনীতি আবর্তিত হোয়েছে। এর শুরু হোয়েছিল নেহরুর নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে, পরে অবশ্য কংগ্রেস (ইন্দিরা), কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী (জগজীবন রাম), অকালি দল (বাদল) বা অকালি দল (মান), জনতা দল (বিজু), ভারতীয় ক্রান্তি দল বা লোকদল (চরণ সিং), তৃণমূল কংগ্রেস (মমতা) ইত্যাদি বহু দলের উদ্ভব এবং কার্যপদ্ধতি বিশেষ ব্যক্তির সংস্পর্শী বা কুহকী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হোয়েছে। ফলে দলে স্বৈরতান্ত্রিক নেতার সৃষ্টি হোয়েছে।

অষ্টমত, ভারতে অধিকাংশ দলের মধ্যে দলীয় সংহতি, ঐক্য ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। বাম দলগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা এর ব্যতিক্রম আছে। কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচনের সময়ে গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিরোধের সৃষ্টি হোয়েছে। ১৯৮৪ সালে বিহারের চন্দ্রশেখর ও জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা গেছে। ১৯৮৬ সালে দলবিরোধী কাজের জন্য প্রণব মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শর্মাকে কংগ্রেস (ই) দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হোয়েছিল। পরবর্তীকালে, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সঙ্গে দেবীলালের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলার সমস্যা সাধারণত দেখা দিয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন দলীয় শৃঙ্খলা ও সংহতির ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখা যায়। এ ব্যাপারে ব্রিটেন কিন্তু স্বতন্ত্র। সেখানে দলীয় শৃঙ্খলা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। ভারত যদিও ব্রিটেনের মতো সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে, তবু বহু দলীয় প্রথা এবং সামাজিক বিভিন্নতা এদেশে শৃঙ্খলা রক্ষার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, গোটা রাজনীতি যখন সুবিধাবাদী বা সুযোগসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেখানে শৃঙ্খলা বা সংহতির অভাব অবশ্যম্ভাবী।

নবমত, ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থায় দলত্যাগ একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা দেখা দেয় যখন কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধানত ক্ষমতার লোভে সেই দলের সদস্যপদ ত্যাগ করে একা বা সঙ্গীদের নিয়ে অন্য এক দলে যোগদান করে। এই দলত্যাগের প্রবণতা অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পায় ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তীকালে যখন রাজ্যস্তরে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য হ্রাস পায়। সমস্যাটি এমন স্তরে পৌঁছায় যে, ১৯৬৭ সালে হরিয়ানা বিধানসভার একজন সদস্য একই দিনে তিনবার দল পরিবর্তন করেন। দলত্যাগের এই তীব্র প্রবণতার তিনটি প্রধান পরিণতি দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, দলত্যাগ করা গণতন্ত্র বিরোধী। কারণ ভোটদাতারা এক প্রার্থীকে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করেন। তাই সেই দল ত্যাগ করে অন্য দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আইন সভার সদস্যপদ বজায় রাখা একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা। জনগণের আস্থার অবমাননা করাই এর পরিণতি। দ্বিতীয়ত, এই দলত্যাগ প্রথার ব্যাপকতা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতিতে এরূপ আচরণ অসাধুতা, দুর্নীতি এবং ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভের সমস্যা সৃষ্টি করে সমগ্র দলীয় প্রথাটাকেই কলুষিত করে তোলে। বামপন্থী দলগুলি অবশ্য এই সমস্যা থেকে মুক্ত।

দলত্যাগের প্রবণতা দূর করার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। ১৯৭৭ সালে জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোয়েছিল। কিন্তু জনতা সরকারের স্বল্পকালের অবস্থিতির জন্য এই অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনী বিল পাশ করে সংবিধানে দশম তালিকা যোগ করা হয়। এই বিল দলত্যাগ বিরোধী আইন বলে পরিচিত। দুঃখের বিষয় এই আইনে কিছু ত্রুটি থাকায় ১৯৮৫ সালের পরেও দলত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার সবশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল জোট-সরকার গঠনের প্রবণতা। এদেশে দলব্যবস্থার বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোন একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হোয়ে আসছে। ফলে কয়েকটি দল নিজেদের মধ্যে জোট গঠন করে সরকার গঠনের চেষ্টা করে। ১৯৭৭ সালে প্রথম জোট-সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। তার আগে রাজ্যস্তরে অনেক জোট-সরকারের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। নব্বই-এর দশকে কয়েকটি জোট-সরকার একের পর এক আসে আর চলে যায়। শেষে ১৯৯৯ সালের NDA জোট প্রায় পাঁচ বছর শাসন করে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে UPA জোট জয়ী হোয়ে বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। ভবিষ্যতে জোট-সরকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১.৩ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শ, কর্মসূচী ও নির্বাচনী কৃতিত্ব (Ideology, Programme and Performance of Different Political Parties)

প্রধান সর্বভারতীয় দলগুলি ঃ

১. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস/কংগ্রেস (ই) (I.N.C./Congress (I)) ঃ

১৮৮৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। শুধু ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলই নয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেসব রাজনৈতিক দল আছে তাদের মধ্যেও সবথেকে প্রাচীন। এই দলের সূত্রপাত হয় স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনকারী গোষ্ঠী হিসাবে। পরবর্তীকালে এটি একটি সর্বভারতীয় সাধারণ রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত হয় এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর এটি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীন ভারতের শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসকে এক দোটানা অবস্থার মধ্যে পড়তে হোয়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কোন্ পথ ভারত বেছে নেবে তা ঠিক করা ছিল বাস্তবিক কঠিন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত দুটি পথ ভারতের কাছে মডেল হিসাবে দেখা দিয়েছিল। একটি হোচ্ছে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক মডেল, অপরটি হোচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক মডেল। কংগ্রেস দলের ঐতিহ্যই ছিল বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সমন্বয়সূচক নীতি গ্রহণ করা। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করে দুটি বিদ্যমান উন্নয়নের কোন মডেলই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না করে কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ একটি তৃতীয় পথের বা মডেলের ধারণা উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে তুলে ধরেন। এই পথ বা মডেলের বৈশিষ্ট্য হোল